আছে দুঃখ - আছে মৃত্যু

ভজন সরকার

আগষ্ট মাস আসলেই চোখের কোণে জল জমে। মন ভারি হয়ে ওঠে । এক বুক চাপা কান্না কখন যেনো সংক্রমিত হয়ে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ে । আড়ষ্ট বেদনার পাথর চোখের জলে ভিজে আরো ভারি হয় । ঝাপসা হয়ে ওঠে নিজের চারিদিক । কিছুতেই তাকানো যায় না কোন দিকে । জল চোখে দেখা যায় না সামনে পেছনে । শুধু বাকি থাকে নিজের ভেতরকে দেখা । বোঝা পড়া নিজের সাথে। নিজের আলোতেই নিজেকে নিংড়ানো । এক নিবিষ্ট ঋষির মতো নিজেকে সতত হাতড়াতে থাকা । মেলাতে চেষ্টা করা এক অদৃশ্য সূতোর সুক্ষ্ম যোগসূত্রে সব বেদনার বিন্দুকে । তারপর আবার এক অস্পষ্ট বেদনার আবহে বিষন্ন মন। এভাবেই প্রতিবার আগষ্ট মাস আসে । শৈশব থেকে কৈশোর পেড়িয়ে আগষ্ট মাসের বেদনার রেখা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় আমার জীবনে। যত সময় পেড়িয়ে যায় সব হারানোর মৌসুম পড়ে আগষ্ট মাসেই যেনো।

(১)

আগে নিজে খুবই ভাবনার ভেতর পড়ে যেতাম যখন ১৫ ই আগষ্টে মন খারাপ থাকতো সবার । সবার মানে - আমার এবং বাবার উভয়ের বন্ধুদেরই । ইস্কুল পেড়িয়ে কলেজে যাবার আগে কিছুদিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পাল্লায় পড়তে পড়তে বাবার ধাতানিতে ফিরে এসেছিলাম । সেই বৈজ্ঞানিক - বিপ্লবী হবার স্বপ্নে বিভোর থাকা বছরখানিক বাদ দিলে ১৫ই আগষ্ট আমার কাছে আত্ম-জিজ্ঞাসার কাল - আত্মশুদ্ধির সময় । নিজেকে প্রশ্ন করবার সময় । দাঁড়াবার সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিপক্ষে । আবার গভীর হতাশারও সময় । অবক্ষয়ের ধাই ধাই উত্থান দেখে । প্রতিক্রিয়াশীলদের দাপট দেখে । নষ্ট হতে দেখে প্রগতিশীল মানুষগুলোকে । বদলে যেতে দেখে প্রগতিপন্থি সংগঠনগুলোকে । নিজের চোখের সামনেই দেখে মানুষ কিভাবে নষ্ট হয়, পঁচে পঁচে গলে যায় । তারপর গন্ধ ছড়ায় চারদিকে । ১৫ই আগষ্ট বাঙ্গালীর জীবনে সেই নষ্ট-পঁচা -গলা মানুষেরও বেড়ে ওঠার মাস ।

ছোট বেলায় যখন ১৫ই আগষ্ট আসতো । খুব মন খারাপ হতো রাসেলের জন্য । বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন ভূখন্ডের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ সন্তান রাসেল । প্রায় একই সময়েই জন্ম আমাদের । ঘাতকের বুলেটে যখন ক্ষত বিক্ষত হয় রাসেলের দেহ, ঘুমে-আর্দ্র মুখখানি যখন মাকে খুঁজছিলো সেই সোনালী ভোরে , সেই সময়ের রাসেল তো আমাদের মতোই একই ক্লাসের ছাত্র । যখন প্রথম এবং শেষবার বঙ্গাবন্ধু ভবনে যাই নব্বইয়ের দশকে প্রবাসী হবার কিছুদিন আগে , ছোট বেলার স্মৃতিতে আঁকা রাসেলের মুখটা মনে পড়ছিলো খুব । তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলাম রাসেলের সব । কোথায় ঘুমাতো রাসেল- কোথায় ঘাতকের কাছে শেষবার বলেছিলো তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার আকুতি । কী সরল বিশ্বাসে ঘাতকের কাছে নিজেকে আত্ম সমর্থন করেছিলো রাসেল মায়ের কাছে যাবার আশ্বাসে? বঙ্গাবন্ধু ভবনের প্রতিটি জায়গায় আমার মনে হয়েছিলো রাসেলের প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে আছে । সেই যে ছোটবেলার এক বালকের অন্তরে বিরহের প্রতিকৃতি আকাঁ হয়েছিলো আরেক বালক রাসেলের জন্য ,সেই মোহেই আচ্ছন্ন ছিলাম আমি সেদিন । বঙ্গাবন্ধ শেখ মুজিবের শোক ছাড়িয়ে বালক রাসেলই হয়ে উঠেছিলো সেদিন মূর্তিমান শোকাধার । প্রতিবারের মতো সেদিনও ভিজে ওঠেছিলো আমার চোখের পাতা । এত লাশ !এত রক্ত! ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে ফিরে এসে অনেকদিন ঘুমুতে পারিনি আমি - পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টের প্রায় বিশ বছর পরেও ।

(২)

এই আগষ্ট মাসেই আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে আরেক ভালবাসার ধন । সেই নীরব নিরবে সরে গেছে আমার জীবন থেকে । আমার বড়মা । এক নিঃসন্তান রমনী । যে আমাদের দু'টি প্রজন্মকে আগলে রেখেছিলো নিজের সবটুকু দিয়ে । আমার এক পিতৃব্যের সাথে বিয়ে হয়ে বড়মা যখন আমাদের সংসারে আসে আমার বাবা তখন পিতৃহীন দশ বছরের এক দুরন্ত বালক । তার পর সেই দূরন্ত বালককে বছর পনেরো বয়সের এক কিশোরী বধূ নিজের সব কিছু দিয়ে মায়ের মতই মানুষ করে তুলেছে । শিক্ষিত করেছে নিজের সব গহনা-গাটি বিক্রি করেও । সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে । আর সেই আস্থাতেই বাবাও তার দু'মাসের শিশু পুত্র সন্তানকে তুলে দিয়েছে নিজের মাতৃসম বৌদির কাছে । সেই থেকেই আমি নিজেকে কখনোই এক মায়ের সন্তান ভাবতে শিখি নি । আমার মাতৃত্ব যেনো ভাগ হয়ে গিয়েছিলো আমার দুই জননীর কাছে । আমার মাও তার নাড়ি ছেঁড়া ধনকে পরম নির্ভরতায় বড়মার কাছে থাকতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে । মায়ের কত আক্ষেপ নিজের ছেলের নামটিও তার মন মতো রাখতে না পেরে । ছোট বেলা থেকেই বাংলা-সাহিত্যের অলিগলিতে বিচরন করে কত স্বপ্ন দেখেছে তার ছেলের নামটিও হবে তার নিজের পছন্দের সেই চরিত্রগুলোর নামেই । কিন্তু সে অধিকারটুকুও মা তুলে দিয়েছিলো আমার বড়মার হাতে । এক পরমা ধার্মিক রমনী তার নিজের বোধের ভেতর থেকে গজিয়ে ওঠা বিশ্বাস থেকেই তার সন্তানের নাম রেখেছিলো ‘‘ ভজন ’’- পারিবারিক ধর্ম-গুরুর নির্দেশ মতোই । আমার সুশিক্ষিত বাবা-মা -যাদের জীবনে ধর্ম চিরকালই নিতান্তই গৌন আর ঠুনকো এক সামাজিক বাতাবরণ ছাড়া আর কিছু নয়, তারাও মেনে নিয়েছিলো আমার বড়মার দেয়া সেই নামটিকেও । আমিও কখনোই প্রশ্ন করি নি । বরং বড়মার দেয়া সেই নামটিই আমার সারা জীবনের পরম অহংকার , মহামূল্যবান অলঙ্কার । তাই যত বার নিজের নাম উচ্চারণ করি , সেই মহীয়সি রমনীকেই স্মরণ করি নিজের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে ।

আমার সেই বড়মা বড়ই আকস্মিক ভাবে আমার জীবন থেকে নিরবে সরে গেছে আজ থেকে পনেরো বছর আগে এক বন্যা-প্লাবিত আগষ্ট মাসে । আমি তখন সবে বুয়েট থেকে পাশ করে এক বেসরকারি ফার্মের হয়ে গোটা উত্তরবংগ চষে বেড়াচ্ছি এক প্রকল্পের উপাত্ত সংগ্রহে । আজ বগুড়া তো কাল রংপুর । পরশু রাজশাহী । এভাবেই গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত আমি । হেড অফিসে না জানিয়েই লাল-চামড়ার সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলাম মানিকগঞ্জের এক উপজেলা ঘিওরের বাসায় । সেখান থেকে গ্রামে যাবো বড়মাকে দেখতে । পুরো আশির দশকের প্রায় প্রতিটি ছুটির দিনেই আমি আসতাম বাসায় ঢাকা থেকে । আর বড়মা গ্রামের বাড়ি থেকে । মা-ছেলের মিলনে আমাদের ছোট্ট পরিবার যেনো খুশিতে ভরে উঠতো ।

সেই বার বাসায় এসে দেখি বড়মা আসে নি । মা বলল কালকেই চল গ্রাম থেকে ঘুরে আসি । সে রাত যেনো আর ভোর হয় না । পরদিন নৌকায় চড়ে থই থই জল পেরিয়ে গ্রামে চললাম । সারা রাস্তা মায়ের সাথে গল্প । নৌকার ছইয়ের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রাম । দীর্ঘ বিলটা পেরুলেই আমাদের বাড়ি । বড়মার সেই ঘর । ঘরের ভেতর নানা রকম দেব-দেবীর মূর্তি । তার প্রায় প্রত্যেকটির গায়েই কাঁচা হাতে লেখা আমার নাম । ছোট বেলায় আমারই হাতের লেখা । বড়মা বড় যত্ন করে রেখে দিয়েছে সেসব । তার কাছে ছেলে আর দেবতা যেনো সমার্থক । ছেলেকে দেবতার হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত দেবতাইতো পুত্রের সমান ভালবাসার । এমন সহজিয়া ধর্মাচরণে ধর্মের গোড়ামিটাই হয়তো ঘুচে যায় এক সময় । ধর্ম হয়ে ওঠে নিতান্তই এক পারিবারিক জীবনাচরণ ।

নৌকা যতই বাড়ির কাছে যাচ্ছে আমার মায়ের মুখ ততই শুকিয়ে যাচ্ছে । আমার শিক্ষিয়ত্রী মা তার সমস্ত ধৈর্য আর সংযমের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিচ্ছে তার ছেলের কাছে । আমি অন্য এক মাকে আবিস্কার করলাম হঠাৎ । প্রবল বেগে জোয়ারের জলে ভেসে যাওয়া বাধের মতোই মায়ের সমস্ত প্রতিরোধ উড়ে গেলো খড়কুটোর মতো। সত্যজিতের সর্বজয়ার মতোই আমার মা আমার কাছে ভেংগে পড়লো আমার বড়মার মৃত্য সংবাদ দিতে। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে । নৌকার মাঝিকে নৌকা ঘুরাতে বলার আগেই নৌকা ভিড়ে গেলো আমাদের গ্রামের বাড়ির ঘাটে । যেখানে আমার বড়মা নেই । আমি ভেতরের সমস্ত কান্নাকে এক নিমিষেই বেধে ফেললাম নিজের ভেতর । সারাবাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরলাম বড়মাকে । কোথাও নেই আমার বড়মা । সারাবাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার স্মৃতি- যার অধিকাংশ জুড়েই আছি আমি । আর তার সকল দেবতা- যাদের প্রতি আমার বিশ্বাস আর ভক্তি কোনটাই জন্মে নি কোন কালেই । তার সিন্দুকের পাশ জুড়ে আমার সেই বর্ণমালার খাতা। বাবার কিনে দেয়া কিছু খেলনার দেহাবশেষ । আমার ছোটবেলার সেই অতি আদরের দুই ব্যান্ডের ভাংগা রেডিও । ইউনেস্কোর সেই রোলটানা খাতা-যার প্রায় প্রতিটি পাতা কী সযত্নে অক্ষত রাখার চেষ্টা । আমার প্রিয় লাটিম, মার্বেলের ব্যাগ, বাবার দেয়া সেই কালো এক জোড়া চামড়ার স্যু যা বাবা কিনে এনেছিলেন কোলকাতা থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধের বছর । দেবতার পাশে অতি যত্নে রাখা আমার চার বছরের সেই ছবিটা- স্পষ্ট সিথি কাটা চুল- যার এক গুচ্ছ বাঁকা করে কপালে নামানো , হাতে বাবার ঘড়ি, টাইয়ের মতো করে গলায় পেচানো গলাবন্ধ । আমার বড়মার রূপকথার রাজকুমারের ছবি । সাথে মাথা উঁচু করে বসা গর্বিতা এক জননী বড়মা । অনেকক্ষন নিরবে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ডুঁকরে কেদে উঠলাম এই প্রথম বার ।

আজো প্রতিটি আগষ্ট মাস আমার বড়মার স্মৃতি বয়ে বেড়ানোর মাস । এক নিঃসন্তান রমনীকে স্মরণ করার মাস । যার ছবি আমার কাছে আজোও কত জীবন্ত! মৃত বড়মার নিস্পান দেহের ছবি আমি আজো কল্পনা করতে পারি না - কল্পনায় আসে না কখনোই । আগষ্ট মাস তাই আরেক অর্থে স্মৃতি র ঝিনুক থেকে মুক্তো কুড়িয়ে নেবার মাস ।

(৩)

স্বাধীনতার কবি সামসুর রাহমানের ''রৌদ্র করোটিতে'' কাব্যগ্রন্থটি প্রথমবার পড়ে গ্রাম থেকে সদ্য শহরে আসা ছেলেটি নাগরিক জীবনের এক অনাস্বাদিত স্বাদ পেয়ে এতোই আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলো যে তার আর ফেরা হয় নি কখনোই স্বভূমিতে । পার্কের বেঞ্চিতে আজো বসলে সহসাই গালে হাত যায় । পরখ করে দেখে চক চকে ব্লেডে দাঁড়ি কামানো গালের মসৃনতা । এক কথায় কবিতার উপাত্ত জীবন থেকে ধার করার বদলে জীবনকে কবিতার মতো মসৃনতায় গড়ে তোলার প্রেরণা সেটা পেয়েছি যাদের কাছ থেকে সামসুর রাহমানও তাদের একজন । রবীন্দ্র নাথ,জীবনানন্দ,আর শক্তির পরেই আরেক শক্তিমান কবি সামসুর রাহমান । ঝক ঝকে নাগরিক জীবনের এক নিপাট কবি । মৌলবাদীদের হাত থেকে রেহাই পেলেও অমোঘ মৃত্যর হাত থেকে দূরে থাকতে পারেননি । এই আগষ্ট মাসেই চলে গেছেন আধুনিক বাংলা কবিতার এক শক্তিশালী স্তম্ভ সামসুর রাহমান । কবিতা দিয়েই আমরা যারা ঘর -গেরোস্থালী সাজাই সামসুর রাহমানের মৃত্যু তাদেরকে ব্যথিত করে প্রতিদিন -প্রতি মূহুর্তে ।

(৪)

ডঃ আহমদ শরীফের অকস্মাৎ প্রয়াণে দুদশকের চেনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তখন শোক আর স্মৃতি-রোমন্থনের বিরান ভূমি আমাদের কাছে । কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে আড্ডা ! অন্তত একজন মধ্যমনি দরকার ।

একদিন হঠাৎ আগমন হুমায়ুন আজাদের । বলতেই রাজী হয়ে গেলেন । অসুবিধা একটিই আসতে একটু দেরী হবে। কারণ ,শাহবাগে তরুন ডাক্তারদের একটা আড্ডা সেরে সন্ধ্যার একটু আগেই পৌছে যাবেন প্রতিদিন । বাবুল ইলেকট্রনিক্সের পাশ থেকে জাতীয় যাদুঘর হয়ে ফুটপাতের পুরনো বইয়ের দোকান -এর ধার ঘেষে হাতের মুঠোয় বেনসন সিগারেট নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকতেন ডঃ হুমায়ুন আজাদ - বাংলাদেশের প্রতিথযশা কবি,সমালোচক ও ভাষাবিজ্ঞানী (এ তিনটিই তাঁর প্রিয় বিশেষন) ।

হঠাৎ আড্ডার চরিত্র বদলে গেল । রাজনীতির প্রতি প্রচন্ডবিমুখ হুমায়ুন আজাদ পেয়ে গেলেন কবিতার আসর । ক্রমশঃ সন্ধ্যা পেরিয়ে নেমে আসত রাত। হাইকোর্টের দিক থেকে কখনও কখনও উঠে আসত চাঁদ । গাছের ফাঁক গলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ত সবুজ ঘাসে । জ্যোৎস্না আর আঁধারের সে মোহনীয় পরিবেশে বেড়ে চলত আমাদের আড্ডা । কবিতার সে মুহুর্তগুলোকে হুমায়ুন আজাদ উপভোগ্য করে তুলতেন তাঁর অতুলনীয় কবিতাবোধ ও বিশ্লেষনী ক্ষমতা দিয়ে । আধুনিক কবিতা যে এমন উৎকৃষ্ট তার উপলব্ধি ও শিল্পিতায় হুমায়ুন আজাদ তা বুঝেছিলেন । আর তাই আধুনিক কবিতায় কি ভাবে মানবিকতা ছাড়িয়ে শিল্পকলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কি ভাবে ভাংগা-গড়ার নামে রীতিমত কবিতাকে কোলাহলের পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে হুমায়ুন আজাদ বর্ননা করতেন অসংখ্য কবিতা উদৃত করে । তাঁর প্রিয় কবিতার অন্যতম দুটি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর “ বেশ্যার মৃত্যু “ ও সুধীন দত্তের “ যযাতি“ থেকে অসংখ্য বার আবৃত্তি করতেন হুমায়ুন আজাদ ।

“ উত্তীর্ন পঞ্চাশ,বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানিং,তবুসেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, (যযাতি, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত) । “

অবাক বিস্ময়ে দেখতাম “যযাতি“ থেকে অনর্গল আবৃত্তি করে যাচেছন বাংলা সাহিত্যের উত্তীর্ণ পঞ্চাশ এক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ -যাঁর মৃত্যু পশ্চিমেই কিন্তু আয়ুর সীমা সামান্যও বাড়েনি মৌলবাদী ঘাতকের ঘায়ে ।

এক আগষ্ট মাসেই তিনি দূরে সরে গেলেন । মৌলবাদী ঘাতক কাঁটা সরিয়ে দিলো তাকে । হাজার হাজার মাইল দূর থেকে তাঁর মৃত্যু সংবাদে চোখের জল ফেলবারও অবসর ছিলো না আমার সেদিন । অবসন্ন- ক্লান্ত আমি অস্তগামী সূর্য্যের আলো-আঁধারিতে লেকের পাড় থেকে কিছু মসৃন নূড়ি কুড়িয়ে ঢেলে দিলাম লেক সুপিরিয়রের সুবিশাল জল-সমুদ্রে । আগষ্ট মাসে হারিয়ে যাওয়া সব প্রিয় জনের উদ্দেশে এছাড়া আর কোন শ্রদ্ধার্ঘ ছিলো না অবশেষ সেদিন । শেঁকড় থেকে সরে আসা প্রবাসী মানুষের স্মৃতি হাতড়ে কুড়িয়ে নেয়া নূড়ি ছাড়া আর কিইবা থাকে !

।। ২০ আগষ্ট,২০০৭ ।।